ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoeeky
সংখ্যা: ৪২/No. 42
ফাল্গুন ১৪১৩/March 2007

সালিশ ব্যবস্থার পুনর্গঠন
মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন প্রসঙ্গ

কে এম মহিউদ্দিন *

Abstract: *Shalish is an old system resolving petty disputes both civil and criminal in local level. Social scientists observed that the poor section of the society is deprived of social justice. Disadvantaged class is often deprived of justice. In recent years NGOs have been intervening the traditional shalish system for refashioning the system. Madaripur Legal Aid Association (MLAA) is pioneer in this field. MLAA has been working to make the traditional shalish system more effective by removing the barriers that do not fabour the poor. This paper attempts to analyze the activities of MLAA in refashioning the traditional shalish system.*

ভূমিকা

প্রাচীন কাল থেকেই গ্রামাঞ্চলে বিরোধ নিরসনে সালিশী ব্যবস্থা চলে আসছে। আর্থিক সুবিধা, দ্রুত নিস্পত্তি, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং আধুনিক বিচার ব্যবস্থার জটিলতার কারণে এখনও বিরোধ নিস্পত্তিতে সালিশী ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াটি গ্রামীণ সাধারণ মানুষের কাছে সরল ও সহজবোধ্য - তবে রাজনীতির ঊর্ধ্বে নয়। এখানে যারা সালিশ কার্য পরিচালনা করে থাকেন তারা গ্রামের প্রধান, কোথাও তাদের প্রামানিক, মন্ডল, মাতব্বর, সর্দার ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়। এই বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের পক্ষপাতিত্ব দেখা যায় এবং কখনো কখনো তারা তাদের দীর্ঘমেয়াদী শ্রেণীস্বার্থের কথা বিবেচনা করে শ্রেণীবন্ধুদের স্বার্থে বিচারকার্যকে প্রভাবিত করে থাকেন। সালিশে নেতৃত্ব প্রদানকারী ধনী অভিজাত শ্রেণীর ওপর সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, সচেতনতার অভাব ও অসংগঠিত হবার কারণে তারা সালিশে বৈষম্যের শিকার হলেও প্রতিবাদ করতে পারেন না বরং ভাগ্যের ওপর নিজেদেরকে সমর্পণ করে থাকেন। আশির দশকের শেষ দিকে প্রথাগত সালিশের সীমাবদ্ধতা দূর করে বিরোধ নিরসনের এই পদ্ধতিকে কার্যকর করে তোলার জন্য বেসরকারি সংগঠন বা এনজিও'র উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এনজিও'র উদ্যোগে কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কিভাবে সালিশ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েসন এর প্রয়াসের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

সালিশ: বিরোধ নিরসনের সনাতন পদ্ধতি

বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি হিসেবে সালিশ ব্যবস্থা নতুন কোন ধারণা নয় - এর শেকড় প্রোথিত আছে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ ও প্রথার ভিত্তিতে বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা বা মীমাংসার জন্য সালিশ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

* সহকারী অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

প্রাচীন ভারতের গ্রামাঞ্চলে বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তিরাই গ্রামের সকল অধিবাসীদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করে শান্তি বজায় রাখতেন। রাজার বিচারালয়ের উৎপত্তি ঘটার পূর্বে গোষ্ঠীপ্রধান বা বয়োজ্যেষ্ঠরাই কেবলমাত্র বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতেন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের নেতৃত্বে বিরোধ মীমাংসার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি 'সংগ্রহ', 'দ্রোণমুখ' ও 'স্থানীয়' নামের তিন ধরনের বিচারালয়ের কথা বলেছেন।[১] কালক্রমে ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসেবে রাজার আবির্ভাব ঘটে এবং ধর্মের বিধিবিধান রক্ষা ও বিবাদ মীমাংসা এবং অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে শান্তি বজায় রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক বিচারালয়ের সূত্রপাত ঘটান। রাজার নিযুক্ত বিচারকরা স্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে ঘটনা জেনে নিয়ে বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। তবে রাজার বিচারালয়ের পাশাপাশি বিরোধ নিষ্পত্তির সনাতন ধারাটি অব্যাহত থাকে। রাজার আদালতের পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও গোত্র ও বর্ণের বিরোধ নিষ্পত্তির কাজটি গোত্রপ্রধান ও স্ব-স্ব বর্ণের বয়োজ্যেষ্ঠরাই সভা বা সালিশের মাধ্যমে করতেন। আন্তঃবর্ণ ও আন্তঃগোত্র সংঘাত হলে পঞ্চায়েত সালিশ পরিচালনা করতেন। গ্রামনি ও গ্রামের প্রধানদের নিয়ে গড়ে উঠা পঞ্চায়েত ছোটখাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধেরও মীমাংসা করতেন। গ্রাম পঞ্চায়েত বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষ এবং বিরোধের বিষয় ভালোভাবে জানতেন, যার ফলে বিরোধ নিষ্পত্তিতে তারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারতেন। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করা না গেলে রাজার আদালতে বিচার হতো, রাজা কিংবা রাজার নিযুক্ত বিচারকগণ স্থানীয় সম্মানীত ব্যক্তির মাধ্যমে ঘটনা জেনে নিয়ে বিচার করতেন। মূলত কুল, সংঘ, গ্রামনি এবং পঞ্চায়েত নামের বিভিন্ন পর্যায়ের অনানুষ্ঠানিক পরিষদগুলো সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করতেন এবং কখনো কখনো শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে শাস্তিও প্রদান করতেন। গ্রামের অভিজ্ঞ, ধনী ও বয়স্করা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হতেন। পঞ্চায়েত ক্ষমতার অপব্যবহার করলে বা কারো প্রতি অবিচার বা কঠোর সাজা প্রদান করলে রাজা বা শাসক তার কঠোরতা নমনীয় করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারতেন।[২] রাজার আদালত গড়ে উঠার পরও সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিরসনের প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকে। ভারতে মুসলমানদের বিজয়ের পরও হিন্দু শাসনামলের ন্যায় গ্রাম পঞ্চায়েত রাজার আদালত বা বিচারালয়ের পাশাপাশি বিবাদ বা বিরোধ মীমাংসায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। ভারতীয় সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে এই অঞ্চলে বৃটিশরাজের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব করায়ত্ত্ব করার মধ্যদিয়ে। এই সময়ে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার আদলে ভারতে বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন শুরু হয়। ঔপনিবেশিক শাসকরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ নিরসনের জন্য আধুনিক কোর্ট প্রতিষ্ঠা করে এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে দায়িত্ব প্রদান করে। কিন্তু আইনগত অনুমোদনের অভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গুরুত্ব হ্রাস পেলেও ছোটখাটো বিরোধ মিমাংসার জন্য সালিশী ব্যবস্থার প্রচলন থেকে যায়। দীর্ঘসূত্রিতা ও অর্থব্যয় লাঘবের জন্য ছোটখাটো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আধুনিক কোর্টের চেয়ে সালিশের গুরুত্ব অধিক।

সালিশ: বিবদমান পক্ষের মধ্যে সমঝোতা

বিবদমান দলসমূহের মধ্যে মীমাংসা বা সমঝোতার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়াটিই হল সালিশ। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ সমঝোতা বা মীমাংমার জন্য মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে থাকে। সালিশ শব্দের উৎপত্তি ফারসি শব্দ থেকে যার আভিধানিক অর্থ মধ্যস্থতা।[৩] কখনো অভিন্ন ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে অমীমাংসিত অবস্থার সৃষ্টি হলে কিংবা

সংঘাত দেখা দিলে সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়। সালিশ একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও আনুষ্ঠানিকতাবিহীন পদ্ধতি যেখানে কোন পক্ষকে শাস্তি প্রদান ও তা কার্যকর করার কোন ক্ষমতা নেই। সালিশের মূল লক্ষ্য হল বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা। সালিশকে কোথাও কোথাও বিচারসভা, আদালত কিংবা অন্য নামেও ডাকা হয়ে থাকে। যেমন জি ডি উড (G. D. Wood) তাঁর গবেষণা এলাকায় বিরোধ মীমাংসার জন্য অনুষ্ঠিত বৈঠক বা সভাকে 'মেল বা দরবার' বলা হয়েছে বলে লক্ষ করেছেন যা সালিশেরই ভিন্ন নাম।[৪] ইয়েনেকা আরেন্স ও ইওসফান ব্যুরদেন বিরোধ মীমাংসা করে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সমাজে অনুষ্ঠিত সালিশকে আদালত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁরা সমাজ বা গ্রামের আদালত ও সভার মধ্যে পার্থক্য করেছেন এই ভাবে যে, আদালত বসে সকালের দিকে আর সভা ডাকা হয় সন্ধ্যার পর বা রাতে। গ্রামে কখন ভোজ হবে এবং কাদেরকে নিমন্ত্রণ করা হবে, গরু ছাগলের হাত থেকে কীভাবে ফসল রক্ষা করা যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পক্ষান্তরে আদালতে বিদ্যমান কোন এক পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার অনুষ্ঠিত হয়। তাঁদের গবেষণায় দেখা যায় যে, বিচারে কখনো শাস্তি প্রদান করা হয় আবার কখনো সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করা হয়।[৫] তবে কোন কোন গবেষক সালিশ ও বিচার ব্যবস্থাকে ভিন্ন ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন, জামান (Jaman) তাঁর এক গবেষণায় বিচার ও সালিশের মধ্যকার পার্থক্যকে এ ভাবে চিহ্নিত করেছেন: বিচারে সাধারণত বিবাদের পক্ষে বা বিপক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট রায়ে পৌছানোর চেষ্টা করা হয়; আর সালিশে দীর্ঘমেয়াদী শ্রেণীস্বার্থের কথা মনে রেখে উভয় পক্ষকে আপোষ-রফায় পৌছানোর চেষ্টা করে।[৬] কিন্তু এলিকসন (Ellickson) বিরোধ নিরসনের প্রক্রিয়াকে তাঁর গবেষণায় ভিন্ন বিষয় হিসেবে চিহ্নিত না করে "বিচার" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বিচারকে বর্ননা করেছেন এক জটিল প্রক্রিয়া হিসেবে যেখানে পরস্পরবিরোধী ব্যক্তি বা গ্রুপের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, সর্দার, মাতব্বররা গ্রামের কোন উন্মুক্ত স্থানে বৈঠকে বসে সকলের সামনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ছোটখাটো পারিবারিক বিরোধের নিষ্পত্তি করে থাকে।[৭] সালিশের রায় বা সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষ মানতে পারে আবার কোন পক্ষ নাও মানতে পারে। তবে সামাজিক প্রথা ও মূল্যবোধজনিত কারণে সালিশের রায় কখনো কখনো অমান্য করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। সালিশকারগণ তাদের প্রজ্ঞা এবং প্রথাগত জ্ঞান দিয়ে মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি করে থাকেন। সালিশকারগণ কোন বিচারক নন। তারা মীমাংসার পদ্ধতিতে সাহায্য করতে গিয়ে মতামত পেশ করতে পারেন। সালিশী ব্যবস্থায় সালিশী ব্যক্তি কোন আইন প্রয়োগ করেন না অথবা কোন মনস্তাত্ত্বিক থেরাপী ব্যবহার করেন না। তিনি বিবাদরত দলকে মীমাংসায় পৌছাতে শুধু আইনের ব্যাখ্যা অথবা মনস্তাত্ত্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। ফজলুল হকের (Fazlul Huq) মতে সালিশে সবার মনস্তত্ত্ব বুঝতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এমন হতে হয় যেন সবাই মনে করে সিদ্ধান্তে তারও অংশ ছিল। মূল কথা হচ্ছে কারো ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে না। আদালতে বিচারক কোন এক পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিয়ে থাকেন কিন্তু সালিশে কোন পক্ষকে শাস্তি না দিয়ে বরং দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করা হয়। আদালতে কোন একপক্ষ জয়ী হয় এবং অপর পক্ষের পরাজয় ঘটে কিন্তু সালিশে দু'পক্ষেরই জিত হয়।

ঝগড়া কিংবা সামাজিক অসদাচরণমূলক বিরোধের সমঝোতা বা মীমাংসার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে (বাড়ী, পাড়া ও গ্রাম) সালিশ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মীমাংসা করার চেষ্টা সবসময়ই

ক্ষুদ্রতম এককের মধ্যে যেমন, পরিবার, পিতৃবংশ ও গ্রামে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কোন একটি পক্ষের কাছে মীমাংসা সন্তোষজনক না হলে বিবরণ শোনা ও বিচার করার জন্য গ্রাম আদালত বসানোর জন্য সে সমাজের কতিপয় মাতব্বরের শরণাপন্ন হতে পারে। যায়েদি (Zaidi, 1970) কুমিল্লার রামনগর ও আলীপুর গ্রামের ওপর সম্পন্ন তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, গ্রামসভাই প্রথমে গ্রামের বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মীমাংসা করার উদ্যোগ নিত, গ্রামের মধ্যকার কোন বিরোধ যখন স্থানীয় মাতব্বররা মীমাংসা করতে পারে না তখন পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাতব্বরদেরকে নিয়ে বড় সালিশের আয়োজন করা হত।[৮] একইভাবে বার্টোচির (Bartocci, 1972) গবেষণায় দেখা দেখা গেছে যে, গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে কোন বিরোধ হলে গোষ্ঠীর সর্দার এবং কখনো কখনো অন্যান্য গোষ্ঠীর সর্দারদের উপস্থিতিতেও মীমাংসার চেষ্টা করা হত। আন্তঃগোষ্ঠী পর্যায়ে কোন বিরোধ হলে গ্রাম পর্যায়ে সালিশের মাধ্যমে তা মীমাংসার চেষ্টা করা হত। এলিকসনের গবেষণায় দেখা যায় যে, পাড়ার মধ্যকার কোন বিরোধ মীমাংসার জন্য পাড়ার নেতারাই সালিশ বা বিচারে বসতেন, তবে বিরোধের মীমাংসা করা সম্ভব না হলে গ্রামের নেতাদের উপস্থিতিতে গ্রাম পর্যায়ে বিচার অনুষ্ঠিত হত। অপরদিকে জি. ডি. উড'র গবেষণায় দেখা যায় যে, বন্দক গ্রামে অধিকাংশ বিরোধ রিয়াই (এক জন নেতা বা সর্দারের নেতৃত্বে বা আশ্রয়ে পরিচালিত ক্ষুদ্রতম জনগোষ্ঠী, একই পাড়ায় একাধিক রিয়াই থাকে এবং একাধিক রিয়াই'র সর্দারদের নেতৃত্বে সমাজ পরিচালিত হয়) পর্যায়ে মীমাংসা করা হত। যদি কখনো মীমাংসা করা সম্ভব না হত তখন বিষয়টি কোন এক পক্ষ অন্য রিয়াই'র সর্দার বা সমাজের কাছে উত্থাপন করতে পারত পুনঃবিচারের জন্য। অবশ্য জি ডি উড বলেছেন যে, অধিকাংশ বিরোধ রিয়াই'র পর্যায়ে এবং খুব স্বল্প সংখ্যক বিরোধের মীমাংসা করার জন্য সমাজ পর্যায়ে মেলা-দরবার বসত। বিরোধ মীমাংসায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা সচরাচর জড়িত হতে চাইতেন না যদি বিষয়টি তার নিজ গ্রামের না হয়। রাজশাহীর ধনঞ্জয় পাড়া ও গোপালহাটিতে ১৯৮৪-৮৫ সালে পরিচালিত করিমের (Karim, 1990) গবেষণায় দেখা যায় যে, গ্রামে সমাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সমাজে নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রধান এবং প্রামাণিকরা সমাজ, আন্তঃসমাজ এবং কখনো কখনো অনুসারী গ্রামবাসীদের পক্ষে কথা বলার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে বিচার, সালিশ এবং গ্রাম আদালতে অংশগ্রহণ করতেন।[৯]

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত সমাজিক গবেষণায় দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলে ছোটখাটো বিরোধ নিরসনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মীমাংসার জন্য প্রথমে ক্ষুদ্রতম এককে অনুষ্ঠিত সালিশ সফল না হলে কিংবা সালিশের রায়ে কোন এক পক্ষ সন্তুষ্ট না হলে পরবর্তিতে বৃহত্তর পরিসরে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। একই বাড়ীর কিংবা একই পাড়ার বা গ্রামের অভ্যন্তরে সংঘঠিত বিরোধ মীমাংসার জন্য বাড়ি, পাড়া এবং গ্রাম পর্যায়ে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। আবার বিবদমান পক্ষ দু'টি ভিন্ন গ্রামের হলে আন্তঃগ্রাম পর্যায়ে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। সালিশ বা বিচার যাই বলা হোক না কেন এবং যে পর্যায়েই অনুষ্ঠিত হোক না কেন বিরোধ মীমাংসার এই প্রক্রিয়াটি স্বাধীন ও স্বেচ্ছায় সংগঠিত হয়।

সালিশে নেতৃত্বের ধরন

সালিশে যারা মধ্যস্থতা করেন কিংবা নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, তারা সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোথাও তাদেরকে প্রধান, প্রামানিক, মণ্ডল কিংবা কোথাও সর্দার বা মাতব্বর নামে ডাকা হয়। যে নামেই ডাকা হোক না কেন তাঁরা গ্রামের ধনী

অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন সামাজিক গবেষণায় দেখা গেছে যে ধনী, প্রভাবশালী ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি উর্বর ক্ষেত্র হচ্ছে সালিশ বা বিচার। দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক, প্রচলিত প্রথা ও মূল্যবোধজনিত কারণে গ্রামীণ ক্ষমতাবানরা দীর্ঘকাল যাবৎ সালিশে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

যায়েদির গবেষণায় দেখা যায় যে, উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রামের ধনী ও প্রভাবশালী পরিবারের প্রধান সর্দার ও মাতব্বরের নেতৃত্বেই গ্রামে ছোটখাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ের মীমাংসা হয়ে থাকে। এমনকি ইউনিয়ন কাউন্সিল কোন বিরোধ মীমাংসা করতো তখন গ্রামসভার সর্দার বা মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতেন। কারণ তাদের সম্মতি ছাড়া গ্রামে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা ছিল প্রায় অসম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কাউন্সিলের তুলনায় গ্রামসভার সিদ্ধান্তের প্রতিই গ্রামবাসীর অধিকতর আস্থা প্রকাশ পেত। বার্টোচি কুমিল্লার হাজিপুর ও তিন পাড়া গ্রামের ওপর এক গবেষণায় দেখান যে গ্রাম দু'টিতে কোন কর্তৃপক্ষ না থাকায় ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার ব্যাপারে সর্দাররাই অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতেন। উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী, প্রতিপত্তিশালী ও জমি নিয়ন্ত্রণকারী ধনীদের মধ্য থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে সর্দারী নির্ধারিত হত। বার্টোচি তাঁর গবেষণায় দেখান যে সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি এবং জমি নিয়ন্ত্রণের ওপর ভিত্তি করেই ব্যক্তির ক্ষমতা নির্ধারিত হয়। বার্টোচি তাঁর গবেষণাধীন গ্রাম দুটোতে বিরোধ মীমাংসার উপায় হিসেবে সালিশ বা বিচারের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। সর্দার নামে উভয় গ্রামে বেশ কিছু প্রভাবশালী শিক্ষিত নেতা ছিলেন। গ্রামে কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ না থাকায় ঝগড়া বিবাদ মীমাংসার ব্যাপারে তাঁরাই অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতেন। বার্টোচির গবেষণায় আরো দেখা যায় যে সর্দার ও গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসায় অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্যরা সব সময় সফল হন না এবং এটা তখনই ঘটে যখন সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সর্দার (বিবাদী) এর অসহযোগিতা করেন। বিবাদী প্রভাবশালী সর্দার এবং বাদী মধ্যম বা নিম্নশ্রেণীর কৃষক পরিবারের সদস্য হলে উপস্থিত সর্দাররা কখনো পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন। আবার কখনো কখনো দোষী প্রমাণিত হলেও প্রভাবশালীদের নেতৃত্বাধীন গ্রুপের সদস্য এমন গরীব ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া যেত না। প্রভাবশালীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণেই তার পক্ষে শাস্তি এড়ানো সম্ভব হত। তাঁর গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে প্রভাবশালীর অনুকূলে আপোসের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা হলেও জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা হত পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে। অভিজন শ্রেণী নিয়মিত পরস্পরের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত থাকায় বিরোধ নিরসনে সালিশ সবসময় প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ হত।[১০]

ইয়েনেকা আরেন্স ও ইওসফান ব্যুরদেন -এর গবেষণায় দেখা গেছে যে, সালিশ নেতৃত্ব দিতেন মণ্ডল পদবীধারী উচ্চবংশীয় ও ধনী জোতদাররা। তাঁরাই ছিলেন সমাজের প্রধান। জমি ও বংশমর্যাদা মন্ডল হবার যোগ্যতা হলেও কেউ কেউ অর্থ ও শক্তির জোরে নিজেকে মণ্ডল রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। যার ফলে দেখা যায় যে, সমাজের প্রধান বা মণ্ডল হওয়াটা কেবলমাত্র উত্তরাধিকারসূত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পরবর্তীতে দেখা গেছে যে গ্রামবাসীরা সবসময় মন্ডল বা সমাজপতিদের প্রতি সবসময় আস্থাশীল থাকে না। সমাজের প্রচলিত প্রথাবিরোধী কর্ম ও পক্ষপাতিত্বের কারণে তাঁরা তাদের কর্তৃত্ব হারাতেন। জাহাঙ্গীর (Jahangir, 1993) সাভারের জিরাবো ও নয়াপাড়া গ্রামে পরিচালিত তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, বিচার বা সভায় ধনী অভিজাত শ্রেণীর যে সদস্যরা নেতৃত্ব দিতেন তাঁদেরকে মাতব্বর বলা হত। তাঁর গবেষণায়ও দেখা যায় যে, নেতৃত্ব শুধুমাত্র উত্তরাধিকারসূত্রেই

নির্ধারিত হত না। সম্পদ, জনপ্রিয়তা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গ্রামের লোকদের সমর্থনের ভিত্তিও নেতৃত্ব নির্ধারণে নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রাখত। তাঁর গবেষণায় দেখা যায় যে, মধ্যম শ্রেণীর একজন যুবক যুক্তি দিয়ে সুন্দরভাবে কথা বলা ও জনপ্রিয়তার জন্য মাতব্বর হতে পারতেন; আবার দরিদ্র হলেও সাংগঠনিক (কৃষক সমিতির সেক্রেটারী) পৃষ্ঠপোষকতার কারণে মাতব্বর হতে পারতেন। তাঁর গবেষণায় দেখা গেছে যে, নবাগত মাতব্বররা পাড়ার লোকদের আপ্যায়ন করার মধ্য দিয়ে নিজেদের মর্যাদাকে বৈধ করতেন।[১১]

জানসেন (Jansen, 1990) এর গবেষণায় দেখা যায় যে, মাতব্বর পদ প্রায় ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। মাতব্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের যথেষ্ট দক্ষতা থাকলে পিতার অবর্তমানে তিনিই মাতব্বর হিসেবে মর্যাদা পেতেন। তবে ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে কথা বলায় দক্ষতা ও মীমাংসা করার জ্ঞান আছে এরকম ব্যক্তিরাও মাতব্বর বলে গণ্য হতেন বা নিজেদেরকে মাতব্বর বলে পরিচয় দিতেন। ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসায় যার যত বেশি ডাক পড়ে মাতব্বর হিসেবে তিনি তত বেশি প্রভাবশালী। তবে জানসেন লক্ষ্য করেছেন যে, উত্তরাধিকারসূত্রে নির্বাচিত মাতব্বররাই অধিক সম্মানের অধিকারী।

সর্দার, মাতব্বর বা মণ্ডল যে নামেই ডাকা হোক না কেন গ্রামের ধনী ও মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের নেতারাই সালিশে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। সময়ের পরিক্রমায় সত্তর দশকের দিকে দেখা যায় যে, নগরায়ন, শিক্ষার প্রসার ও অর্থ এবং শক্তির জোরে সর্দার বা মাতব্বর কিংবা মন্ডল বংশের সদস্য নন এরকম ব্যক্তিরাও সালিশে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ পান। তবে সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে তারা সনাতন সর্দার, মাতব্বর কিংবা মন্ডলদের সমকক্ষ বলে বিবেচিত হতেন না। করিমের (Karim) গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিচার বা সালিশে উপস্থিত সকল প্রধান বা প্রামাণিকই সমান মর্যাদা পান না- বৃহৎ বংশ থেকে আসা পূর্ব-পুরুষের সালিশ বা বিচার করার ঐতিহ্য রয়েছে এরকম বংশের প্রধান বা প্রামাণিকরাই নতুনদের তুলনায় বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকেন।

করিমের (১৯৯০) গবেষণায় দেখা যায় যে, সমাজের বিচার বা সালিশের পাশাপাশি গ্রাম আদালতের মত আনুষ্ঠানিক পরিষদের মাধ্যমেও বিরোধের মীমাংসা হয়ে থাকে। গ্রাম আদালত অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৭৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদকে ছোটখাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ-বিবাদ মীমাংসার জন্য গ্রাম আদালত গঠনের এখতিয়ার প্রদান করা হয়। এর মধ্যদিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ মীমাংসা ও প্রয়োজনে শাস্তি প্রদানের আইনগত অধিকার লাভ করে। তবে গ্রাম আদালত ব্যবস্থার পরও সালিশের অস্তিত্ব বিলীন হয়নি বরং গ্রাম আদালতের পাশাপাশি সালিশী ব্যবস্থাও পূর্বের ন্যায় কার্যকর থাকে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে আইন বিষয়ে জ্ঞানের অভাব, নথিপত্র সংরক্ষণে অজ্ঞতা, স্বজনপ্রীতি এবং সর্বোপরি গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসায় জনপ্রতিনিধিদের অধিক সময় প্রদানে অনাগ্রহের কারণে গ্রাম আদালত যথেষ্ট কার্যকর হতে পারেনি। বাংলাদেশের তিনটি জেলায় সম্পন্ন এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সালিশের মাধ্যমে কোন বিরোধের নিষ্পত্তি করা না গেলে অথবা সালিশের রায়ে কোন এক পক্ষ অসন্তুষ্ট হলে ইউনিয়ন পরিষদের কাছে বিবাদরত কোন এক পক্ষ পুনর্বিচারের জন্য আবেদন করে। আবার কখনো কখনো দেখা গেছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের কাছে আবেদন করা হলেও বিষয়টি গ্রাম আদালতের রেজিস্টারে নথিভুক্ত না করে চেয়ারম্যান এবং পরিষদের সদস্যরা স্থানীয় নেতাদেরকে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধের মীমাংসা করেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, লিখিত অভিযোগ প্রদানে বিবদমান পক্ষের অনাগ্রহ এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে বিরোধ নিষ্পত্তিতে ইউনিয়ন

পরিষদের সচিবকে আবেদন পত্র গ্রহণ, বিবাদীকে সমন নোটিশ প্রেরণ, সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া অনুসরণে অনাগ্রহের কারণে ইউনিয়ন কার্যালয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের উপস্থিতিতে অনানুষ্ঠানিকভাবে বিরোধের মীমাংসা করা হয়। গবেষণা এলাকায় দেখা গেছে যে, ছয়টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র একটিতে সপ্তাহে একদিন গ্রাম আদালতের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এছাড়া গ্রাম পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সালিশে স্থানীয় নেতাদের পাশাপাশি যে ওয়ার্ডে বিরোধ সংঘঠিত হয়, সেখানকার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যও সালিশে উপস্থিত থাকেন। গবেষণা এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধি ও স্থানীয় নেতাদের উপস্থিতিতে যেমন সালিশের মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয় তেমনি গ্রাম আদালতের মাধ্যমে আনুষ্ঠনিকভাবে বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়। আরো দেখা গেছে যে, অনানুষ্ঠানিকভাবে বিরোধ নিস্পত্তির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা গ্রাম সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের ওপর বিচারমূলক ক্ষমতা অর্পণ করা সত্ত্বেও আইন বিষয়ে সীমিত ধারণা, আনুষ্ঠানিকতা পালনে বিড়ম্বনা ও সময় প্রদানে অনীহার কারণে চেয়ারম্যান ও সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের পরিবর্তে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিকেই উৎসাহিত করে থাকে। এছাড়া বিরোধ সংঘটিত হবার পর সরাসরি আদালতের শরণাপন্ন হওয়াকে সামাজিকভাবে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়। সালিশকে উপেক্ষা করে সরাসরি আদালতে অভিযোগ দাখিল করা সমাজ অমান্য করার অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সালিশের রায় প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে এর নেতৃত্বের প্রকৃতির ওপর। সালিশে মধ্যস্থতাকারী তাঁর নিরপেক্ষতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে যেমন খুব সহজেই ঝগড়া বা বিবাদ মীমাংসা করতে পারে আবার তেমনি পক্ষপাতিত্ব, শ্রেণীস্বার্থ ও গ্রামীণ রাজনীতিতে দলাদলির কারণে মাতব্বররা সালিশী প্রক্রিয়ায় অনুসারীদের সুযোগ প্রদান ও প্রতিপক্ষকে অবদমিত করে রাখতে পারে। ইয়েনেকা আরেন্স ইওসফান ব্যুরদেন বলেছেন যে, ধনী গৃহস্থদের মধ্যকার বিরোধ অথবা ধনী গৃহস্থ বিবাদী ও দরিদ্র কৃষক বাদী হলে বিচার করার ক্ষমতা আদালতের নেই। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। গবেষকদ্বয় গ্রামের সনাতন বিচার ব্যবস্থাকে দেখেছেন ধনীদের শোষণযন্ত্র হিসেবে। কেননা শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর বিরুদ্ধে যখন কোন ধনী গৃহস্থ অভিযোগ আনে তখনই কেবল আদালতে বিচার হয়। আবার করিম তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, গ্রামের মণ্ডলরা মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার খাতিরে গ্রাম আদালতকে ব্যবহার করে থাকে। ধনী জোতদারদের বিরুদ্ধে দরিদ্র লোকদের বিচারের ক্ষেত্রে আদালত নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এমনকি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসায়ও আদালত নিষ্ক্রিয় থাকে। জানসেন তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, সালিশে সবসময় বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। কেননা বিবদমান পক্ষদ্বয় এবং মাতব্বর সকলকে গ্রামে পরস্পরের কাছাকাছি বাস করতে হয়। সালিশের রায় আদালতের রায় থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে এ কারণে যে, মাতব্বররা বিবাদকারীদের জীবনবৃত্তান্ত এবং বিবাদের বিষয় সম্পর্কে সরকারি আদালতের চেয়ে বেশি জানে । তবে সালিশে মাতব্বররা সবসময় নিরপেক্ষ থাকেন না, নিজেদের স্বার্থে কখনো কখনো পক্ষপাতিত্ব করেন। একইভাবে জাহাঙ্গীরের গবেষণায় দেখা যায় যে, বিচারসভায় বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে মাতব্বররা সকল ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। নিজেদের মধ্যকার স্বার্থের সংঘাতের কারণে যা সৃষ্টি হয় অনুসারী বা পাড়ার সদস্যদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা বা হারানোকে কেন্দ্র করে, বিচারসভায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। নারী-পুরুষ সকলেই বিচারসভায় তাদের অভিযোগ জানাতে পারে। তবে কোনো ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে

কোন গরীব ব্যক্তি অভিযোগ করলে বিচারে বা সালিশে বিবাদীর বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব হয় না। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সালিশে মাতব্বররা কখনো কখনো নিরপেক্ষতার ভান করলেও কার্যত নিজ নিজ অনুসারীদের পক্ষে অবস্থান নেন। তাঁর গবেষণায় দেখা যায় যে, গ্রাম্য দলাদলির কারণে ছোটখাটো বিরোধও অনেক সময়ে বিচারসভায় মীমাংসা করা যায় না বরং তা আরো বৃহৎ আকার ধারণ করে।

গ্রামীণ সমাজে শৃঙ্খলা ও বিরোধ মীমাংসা করে শান্তি বজায় রাখার জন্যই সালিশী ব্যবস্থার উদ্ভব এবং সালিশের নেতৃত্ব ও শ্রেণী স্বার্থের কারণে সালিশ ব্যবস্থায় ধনীদের প্রভাবমুক্ত নয়। সেজন্য সালিশকে গ্রামীণ ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা প্রকাশের মুখ্য উপায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এসত্ত্বেও গ্রামের অধিকাংশ বিরোধ আদালতের পরিবর্তে স্থানীয় পর্যায়ে মীমাংসার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। বর্মন (Barmon)তার এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, সালিশের মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসার হার যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও অন্যান্য কারণে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ৭৪ শতাংশে নেমে আসলেও তাঁর গবেষণায় দেখা যায় যে, বিরোধ নিরসনে সালিশ এখনও অধিকাংশের কাছে সহজ ও কার্যকর ব্যবস্থা।[১২]

সালিশের গুরুত্ব

বিরোধ নিস্পত্তির প্রক্রিয়ায় সালিশে আনুষ্ঠানিকতা বা পদ্ধতিগত জটিলতার পরিবর্তে খোলামেলা ও স্বেচ্ছায় বিবদমান পক্ষদ্বয়ের আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সমঝোতায় পৌছানো হয়। ফলে কোন এক পক্ষের অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও অন্য এক পক্ষের খুব বেশি লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা কম। সালিশে বিবাদের সমঝোতা বা মীমাংসা করা হয়- কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড প্রদানের সুযোগ নেই। কঠোর শাস্তির সম্ভাবনা না থাকায় অভিযুক্ত পক্ষ খুব সহজেই তার ত্রুটি স্বীকার করে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চায়। বিবদমান পক্ষদ্বয় এবং সালিশকার সকলকে এক সঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাস করতে হবে- এই বাধ্যবাধকতা থেকেও বিরোধকে স্থায়ী না করে মীমাংসার চেষ্টা করা হয়।

আদালতে বিরোধ নিস্পত্তির প্রক্রিয়াটি সম্পুর্ণ আনুষ্ঠানিক এবং বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়। বিবদমান পক্ষদ্বয়ের আইনজীবীদের ব্যাখ্যা, জেরা, সাক্ষ্য প্রমাণ এবং ডকুমেন্ট উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে অপরাধ নিরূপণ ও অপরাধী শনাক্ত করা হয়। বিচারকের কাছে বিবদমান পক্ষদ্বয় অপরিচিত ঘটনা হওয়ায় নিরপেক্ষ বিচার প্রাপ্তি ঘটে বটে তবে কখনো কখনো আইনজীবীদের জেরার মারপ্যাচের কারণে নির্দোষ ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হয়ে যায় এবং ছোট অপরাধও বড় অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে মানবিকতার চেয়ে আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রাধান্য পায়।

আইনগত জটিলতা ও বাধ্যবাধকতা না থাকায় বিরোধ নিস্পত্তিতে সালিশ হয়ে উঠে সহজ ও সকলের কাছে বোধগম্য মাধ্যম। ফলে স্বাধীনভাবে নিজের মনের গোপন ক্ষোভ বা অভিযোগ সহজেই প্রকাশ করতে পারে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয় এরকম কারো পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা বা মিথ্যা সাক্ষী প্রদানের সুযোগ নেই বললেই চলে। তা' ছাড়া পক্ষদ্বয় পরিচিত হওয়ার কারণে সালিশকারদের পক্ষে তাদের মনস্তত্ত্ব বুঝে মীমাংসার সফল কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব হয়। তবে সবসময় সালিশ সম্পূর্ণ হওয়া অর্থাৎ বিরোধের সফল নিস্পত্তি করা সম্ভব নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিকবার সালিশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিরোধের নিস্পত্তি করা সম্ভব না হলে বিষয়টি আদালতে চলে যায়।

ছোটখাটো বিরোধ বা অভিযোগ নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া বিবদমান কোন পক্ষের জন্যই অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাজনক নয়। আদালতে অভিযোগ দাখিল করার মধ্য দিয়ে দারিদ্রকরণের দুষ্টচক্রের প্রবেশ ঘটে। মামলা নিষ্পত্তির দীর্ঘসূত্রিতা বাংলাদেশে আদালতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ দীর্ঘসূত্রিতার মধ্য দিয়ে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকে মামলার খরচ চালাতে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় বহন করতে হয়। অধিকাংশ বিবদমান পক্ষদ্বয়কে মামলার ব্যয় বহনের জন্য চাষের জমি এমনকি ভিটেমাটি পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়। উচ্চহারে অর্থ ঋণ করে কিংবা নিজের জমি বিক্রি করে মামলা চালাতে গিয়ে বিবদমান পক্ষদ্বয় ক্রমাগত নিঃশেষ হতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে এরকম প্রবাদ আছে যে শত্রু তার শত্রুকে অভিশাপ দেয় এই বলে যে, "তোকে যেন মামলায় ধরে।"

আদালতে মামলা বা অভিযোগের সংখ্যা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদির তুলনায় বেশি হওয়ায় স্বভাবতই বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটি দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। কিন্তু এমন কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে যেগুলো স্থানীয় পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে মীমাংসা করে আদালতের ওপর চাপ কমানো সম্ভব। সালিশের মাধ্যমে বিরোধের দ্রুত ও সহজ সমাধান করে বিবদমান পক্ষদ্বয়কে একসঙ্গে বসবাসের উপযোগী ব্যবস্থাও নেওয়া সম্ভব হয়। সালিশের মাধ্যমে বিরোধকে স্থায়ী না করে কোন প্রকার অর্থ ব্যয়, কখনো কখনো স্বল্প ব্যয়ে মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। তবে সালিশের কাঠামো অপরিবর্তিত থাকায় এর সীমাবদ্ধতাকে অনেকাংশে অতিক্রম করা সম্ভব হয় না।

সালিশী ব্যবস্থার পুনর্গঠন

সালিশের সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষমতা নেই এবং সিদ্ধান্ত পালনে কেউ বাধ্যও নয়। এর জন্য সালিশে কেউ চূড়ান্ত সমাধানও দিতে পারে না। কোন এক পক্ষকে অসন্তুষ্ট করার ঝুঁকি কম নেওয়া হয় বলে সালিশ কখনো কাছাকাছি বা আপাত সমাধানই দিতে পারে। আবার কখনো তাও দিতে পারে না। সালিশ গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা প্রকাশের মুখ্য উপায়। সালিশে নেতৃত্ব দেয়ার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ ক্ষমতাবানরা দরিদ্রদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তারা তাদের শ্রেণীস্বার্থে বিবদমান পক্ষের মধ্যে নিজ শ্রেণীর অথবা অনুসারীর পক্ষে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে থাকে। এ ছাড়া গ্রামীণ দলাদলির রাজনীতিও সালিশকে বিলম্বিত ও কোন কোন ক্ষেত্রে অমীমাংসিত রাখে যখন বিবদমান পক্ষদ্বয় দু'দলের অনুসারী হয় এবং উভয় দলের নেতারা সালিশে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। স্ব স্ব অনুসারীদের পক্ষ অবলম্বন করায় সালিশ দীর্ঘায়িত হয়, একাধিকবার বসে এবং কখনো কখনো বিষয়টি অমিমাংসিত থেকে যায়।

প্রচলিত প্রথা, মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে সালিশ পরিচালিত হয়ে থাকে। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয়রা বংশ পরম্পরায় যে প্রথা অনুসরণ করে আসছেন তা তাদের ক্ষমতাকে নিশ্চিত ও কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। গ্রামের প্রচলিত প্রবাদ থেকেই এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝা যায় যেমন, মাতব্বরের ছেলে মাতব্বর হবে, মানী লোকের মান দিতে হয়। প্রচলিত প্রথার কারণে নারীদের সালিশে মুখ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ নেই। শুধুমাত্র কোন ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেই তবে তাদের সালিশে ডাকা হয় সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কিংবা শাস্তি দিতে। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কথা বলে বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে সালিশে মেয়েদেরকে কঠোর সাজা পর্যন্ত দেয়া হয়েছে এবং সাজাপ্রাপ্ত মেয়ে রাগে-ক্ষোভে আত্মত্যাগ করেছে। ফলে সালিশের মত কার্যকর একটি ব্যবস্থারও বিরোধ

নিরসনে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সালিশকারদের (সর্দার বা মাতব্বর) ভূমিকা মধ্যস্থতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে থাকে। ফলে সালিশ একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমাধান পদ্ধতি থাকে না।

স্বল্প সময়ে ও স্বল্পব্যয়ে স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিরসনের কার্যকর ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যবস্থা হিসেবে সমাজের প্রয়োজনেই সালিশের গুরুত্ব এখনো রয়েছে। শান্তিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিরোধ নিরসনের সনাতন এ মাধ্যমটির পদ্ধতিগত জটিলতা না থাকলেও নেতৃত্ব প্রদানকারী ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা প্রকাশ ও দরিদ্রদের অবদমিতকরণের প্রচেষ্টার কারণে তা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। সালিশে নেতৃত্বদানকারী অভিজাত শ্রেণী তাদের শ্রেণীস্বার্থে দরিদ্রদের অবদমন ও স্বশ্রেণীর বিরোধকারীর পক্ষে রায় প্রদান এবং সালিশকে শোষণের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেও অর্থ ও সময়ের সাশ্রয়, শাস্তির পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি, কোর্ট বা আদালতের তুলনায় সালিশে অভিযোগ উত্থাপন ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সহজ পরিবেশ থাকা ইত্যাদি নানা কারণে সালিশ এখনো বসে, বিবাদ সৃষ্টি হলে তা মীমাংসার জন্য আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে যাবার পূর্বে সালিশের মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

সংগঠনহীনতা, শ্রম বিক্রি, জমি বর্গা কিংবা জমির জন্য পানি, ঋণ বা বন্ধক ইত্যাদি নানা কারণে বিচারের জন্য দরিদ্রদেকে এখনো সমাজের নেতাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রচলিত মূল্যবোধ ও প্রথার কারণে সালিশে সর্দার, মাতব্বর, প্রধান বা প্রামাণিকরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। সালিশে দরিদ্র নারীদের নিপীড়িত হবার ঘটনা এখন আর অমূলক বা অসত্য নয়—একথা আমাদের সকলের জানা। এ ব্যপারে বিশ্ববাসীকে জনানোর জন্য বিভিন্ন মাধমে বিদেশেও প্রচারিত হচ্ছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রথা ও মূল্যবোধ তৈরী করে পুরুষেরা; সেজন্য পারিবারিক বিরোধ এমনকি কোন নারীর যৌন হয়রানির বিচার করার সময়ও নারীর ওপর দায়ভার চাপানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। বিষয়টি আরো ভয়ংকর হয়ে উঠে যখন সালিশের রায় বা সিদ্ধান্তকে ধর্মীয় নেতারা নিজস্ব আদলে ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে বৈধতা প্রদান করেন। এঅবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের বিপরীত স্রোতে না গিয়ে নারীর প্রতি সহিংস মনোভাব পরিবর্তন করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পারিবারিক বিরোধের মীমাংসা, সালিশে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ ও পারিবারিক আদালতকে কার্যকর করার জন্য আশির দশকের শেষ দিকে জাতীয় পর্যায়ে কয়েকটি এনজিও সনাতন সালিশ ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং সাধারণ জনগণ ও সালিশকারদের আইনগত সাধারণ ধারণা প্রদানের মাধ্যমে কোর্টের বিকল্প হিসেবে ছোটখাটো বিরোধ মীমাংসায় সালিশী ব্যবস্থাকে ইতিবাচকভাবে কার্যকর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাদারীপুর লিগাল এইড অ্যাসোসিয়েশন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাঁচতে শেখা, নাগরিক উদ্যোগ, সমতা, সমাজ প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কেন্দ্র ইত্যাদি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সালিশ ব্যবস্থা পুনর্গঠনে এনজিওগুলো বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র নারী-পুরুষদেরকে সংগঠিত করে সালিশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করছে। প্রচলিত সালিশে গৃহীত সিদ্ধান্তের কোন লিখিত ডকুমেন্ট না রাখার প্রচলন থাকায় খুব সহজেই সালিশের রায় উপেক্ষা করা যায়। সেজন্য এনজিওগুলো সালিশের জন্য অভিযোগ গ্রহণ, প্রতিপক্ষকে সে বিষয়ে অবহিতকরণ, সালিশের স্থান ও সময় নির্ধারণ এবং সালিশের রায় ইত্যাদি বিষয়গুলো লিখিতভাবে সম্পন্ন করে থাকে। এনজিওগুলো তাদের নিজেদের কর্মীদের মাধ্যমে সালিশের যাবতীয় বিষয়ের

মনিটরিং করে থাকে। এমনকি সালিশে বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে অথবা বিবাদী সালিশের রায় উপেক্ষা করলে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য এনজিওগুলো দরিদ্র পক্ষকে আদালতে আইনগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। সালিশী ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও দরিদ্র নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্য এনজিওর কর্মসূচিগত পার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্যগত অভিন্নতা রয়েছে। তবে প্রচলিত সালিশের সীমাবদ্ধতা দূর করে স্বল্প সময়ে ও নিরপেক্ষভাবে স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিরসন করাই এনজিওর মূল লক্ষ্য।

সালিশী ব্যবস্থার পুনর্গঠনে এনজিও: মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েসন (এম. এল. এ. এ.)

দরিদ্র মানুষের আইনী সহায়তা প্রদান ও সালিশী ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য ১৯৭৮ সালে এম. এল. এ. এ. প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন (এম. এল. এ. এ.) প্রথম বেসরকারি সংগঠন বা এনজিও যারা তৃণমূল পর্যায়ে স্বল্প সময়ে ও বিনা খরচে পারস্পরিক বিরোধ মিটাতে আইন সহায়তা দানের পাশাপাশি সালিশ ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর ও গতিশীল এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে। এম. এল. এ. এ. বিচার ব্যবস্থার বিকল্প ধারা হিসেবে সালিশী ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য সনাতন সর্দার, মাতব্বরদের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে সালিশ কমিটির গঠন, সালিশের জন্য অভিযোগ লিপিবদ্ধকরণসহ নিষ্পত্তিকৃত বিষয়ে সময়ে সময়ে তদারকি করে।

এম. এল. এ. এ. তাদের কর্ম-এলাকায় প্রতিটি গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণী এবং পেশার (ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধি, স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক, বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রভাবশালী প্রমুখ) লোকদের নিয়ে গ্রাম পর্যায়ে কমিটি গঠন করে। একটি ইউনিয়ন নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ৮ থেকে ১০ জন সদস্য নিয়ে ওয়ার্ডভিত্তিক গ্রাম সালিশ কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিটি গ্রাম কমিটি থেকে একজন করে প্রতিনিধি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক যোগ্য প্রতিনিধি থাকলে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে ১০ থেকে ১৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে ইউনিয়ন সালিশ কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। সালিশ কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রয়েছে। তবে বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সালিশ কমিটির সদস্য ছাড়াও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত থাকেন। গবেষণাধীন দুটি ইউনিয়নের অধিকাংশ সালিশে লক্ষ্য করা গেছে যে কমিটিভুক্ত সকল সদস্য সালিশে উপস্থিত থাকেন না। কমিটিভুক্ত এবং কমিটিবহির্ভূত ৪-৭ জন মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীর উপস্থিতিতে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। এম. এল. এ. এ.'র উদ্যোগে মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার ১৫টি উপজেলার ১৯১টি ইউনিয়নে সালিশী ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য কাজ করছে। এসকল ইউনিয়নে পুরুষ এবং মহিলা উভয়কে গ্রাম সালিশ কমিটি গঠন করে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সালিশ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়।

এম. এল. এ. এ. সালিশে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মতামত বা বক্তব্য পেশ করার পর তাদেরকে সমঝোতায় বা মীমাংসায় উপনীত হতে সালিশকারদের মধ্যস্ততার কৌশল, বিবাদরত দলকে আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। সালিশের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দিয়ে বরং বিবদমান পক্ষদ্বয়কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করার কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য সালিশকারদের (গ্রাম ও ইউনিয়ন সালিশ কমিটির সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিদেরকে) ১দিন ও ৩দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পারিবারিক

আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য স্কুল, মাদ্রাসা অথবা কলেজের ক্লাসরুমে ১দিনের জন্য জনসংযোগ অনুষ্ঠান এবং নিয়মিত সালিশে অংশগ্রহণ করে থাকে। এরকম স্থানীয় ব্যাক্তি ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদেরকে নিয়ে ৩দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এম. এল. এ. এ'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সালিশী প্রক্রিয়াটি শুরু হয় মীমাংসার জন্য বিবদমান কোন এক পক্ষের আবেদন গ্রহণের মধ্য দিয়ে। সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে বাদী সুবিচারের জন্য সালিশ অনুষ্ঠানের আহ্বান করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, আবেদনপত্রটি বাদীর পক্ষে বাদী নিজেই পূরণ করেন। বিরোধ নিরসনের জন্য আবেদন পাবার পর সালিশকর্মী আবেদনে উল্লিখিত ঘটনার যথার্থতা যাচাই-এর জন্য প্রাথমিক তদন্ত করে থাকেন। তবে গবেষণা এলাকায় সালিশকর্মীকে সকল আবেদন এর ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত না করে শুধুমাত্র মারপিট সংক্রান্ত অভিযোগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ফসলের ক্ষতি কিংবা চুরির ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত করার তথ্য পাওয়া গেছে এবং এ সকল তদন্ত প্রতিবেদনের প্রতিটি ঘটনা আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখা হয়। সালিশকর্মী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সালিশের তারিখ নির্ধারণ করে প্রতিপক্ষকে মীমাংসার তারিখ ও স্থান এবং অভিযোগের বিবরণ জানিয়ে নির্ধারিত ফর্মে পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র সাধারণ ডাকযোগে বা কারো মারফৎ বিবদমান পক্ষদ্বয়ের কাছে প্রেরণ করা হয়। এর পাশাপাশি সালিশকর্মী সালিশ কমিটির সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সালিশ বৈঠকে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে থাকেন। সালিশে ডকুমেন্টেশনের পুরো প্রক্রিয়াটি শুরু হয় বিবদমান কোন এক পক্ষের আবেদনের, প্রতিপক্ষকে সালিশে উপস্থিত করার জন্য পত্র প্রদান, সালিশে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও উপস্থিত সালিশকারগণের নাম ও স্বাক্ষর নিয়ে নির্ধারিত ফরমেটে সালিশ বৈঠকের কার্যবিবরণী লেখা। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, যৌতুক, পারিবারিক বিরোধ ও অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুষ্ঠিত সালিশের প্রথম বৈঠকে প্রতিপক্ষের উপস্থিতির হার কম এবং এক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রথম বৈঠকে প্রতিপক্ষ বৈঠকে উপস্থিত না হলে বৈঠকের পরবর্তী তারিখ জানিয়ে তাকে পুনরায় চিঠি প্রদান করা হয়। বর্তমান গবেষণায় মারপিট, সামাজিক বিরোধ, অর্থ সংক্রান্ত ৩০টি বিরোধ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, এ ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুষ্ঠিত ২৫টি সালিশের প্রথম বৈঠকেই প্রতিপক্ষ উপস্থিত ছিলেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ প্রথম বৈঠকে উপস্থিত না থেকে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা সদস্য, পাড়া কিংবা গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ অথবা সংশ্লিষ্ট ঘটনার আইনগত দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞ এরকম ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য সালিশের তারিখ পুনর্নির্ধারণের জন্য সালিশকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন। গবেষণা এলাকায় সালিশের প্রথম বৈঠকে উপস্থিত না থেকে ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ সদস্যের মাধ্যমে বৈঠকের পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করে থাকেন। যৌতুক, দ্বিতীয় বিয়ে ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেই এরকম ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে।

সালিশে উভয় পক্ষের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কখনো কখনো প্রথম বৈঠকের পর উপস্থিত সালিশীকাররা নির্ধারিত পরবর্তী বৈঠকের পূর্বে স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সময় বা সুযোগ নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কখনো সালিশের পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই স্থানীয়ভাবে অনুষ্ঠিত সালিশে বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়। এক্ষেত্রে সালিশকার ও বিবদমান পক্ষদ্বয় কি কি শর্তে বা কৌশলে বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়েছে সে সম্পর্কে সালিশকর্মীকে

অবহিত করে থাকে এবং সালিশকর্মী মীমাংসাপত্র ও রেজিস্টার খাতায় উক্ত মীমাংসার বিবরণ ও শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখে। সালিশকর্মী নিজে সালিশের জন্য অনুষ্ঠিত প্রতিটি বৈঠকের মীমাংসাপত্রে উপস্থিত সালিশকারগণের নাম ও স্বাক্ষর, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং যে ক্ষেত্রে পরবর্তী বৈঠকের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে সালিশ বৈঠকের পরবর্তী তারিখ এমনকি কোন পক্ষ অনুপস্থিত থাকলে তার বিবরণসহ বৈঠকের কার্যবিবরণী সালিশকর্মী নিজে লিখে থাকেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, অভিযোগপত্র বা আবেদনপত্র গ্রহণের মধ্য দিয়ে সালিশ প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং উভয়পক্ষের সমঝোতার মধ্য দিয়ে সালিশের সমাপ্তি ঘটে।

গবেষণা এলাকায় দেখা গেছে যে, স্থানীয়ভাবে অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যরা যখন কোন বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারেন না অথবা নিষ্পত্তিকৃত বিষয়টি নিয়ে পুনরায় সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি সংস্থাটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত সালিশের পুরো ব্যবস্থাটি সম্পন্ন হবার পূর্বেই স্থানীয়ভাবে বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয় এবং এ ধরনের উদ্যোগকে এম. এল. এ. এ. উৎসাহিত করে থাকে। সাধারণত কোন পক্ষ যদি স্থানীয়ভাবে অনুষ্ঠিত সালিশে সুবিচার পায়নি, এরকম মনে করে অথবা স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তিকৃত সালিশের শর্তসমূহ প্রতিপক্ষ মানছে এ রকম ঘটনা ঘটে সে ক্ষেত্রে একই বিষয়ে এম. এল. এ. এ'র মাধ্যমে পুনরায় সালিশ অনুষ্ঠানের আবেদন করা হয়। অপর দিকে বিবদমান পক্ষদ্বয় যদি মনে করে এম. এল. এ. এ'র কর্তৃক অনুষ্ঠিত সালিশে তাদের উভয়পক্ষকে সমঝোতার জন্য ক্ষতিপূরণ কিংবা সময় ব্যয় করতে হবে সে-ক্ষেত্রে দুটি সালিশ বৈঠকের মাঝামাঝি সময়ে স্থানীয়ভাবে বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়। কখনো কখনো স্থানীয় মাতব্বরা যদি বিবদমান উভয় পক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় সেক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নিজের অনুসারীর বিজয় নিশ্চিতকরণের জন্য সালিশকে দীর্ঘায়িত করে থাকে।

এম. এল. এ. এ'র কর্ম-এলাকায় পারিবারিক ও যৌতুক সংক্রান্ত বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সালিশ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তারপর জমি, অর্থ ও নারী নির্যাতন বা মারপিট সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যায়ক্রমে অধিক সালিশ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জুলাই ২০০৫ থেকে জুন ২০০৬ সালে এম. এল. এ. এ.'র কর্ম-এলাকায় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ১০,৬৯৫টি আবেদন করা হয়। তার মধ্যে ৭,৯৮৬টি বিরোধ সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। নিষ্পত্তিকৃত সালিশের মধ্যে পারিবারিক বিরোধের সংখ্যা ছিল ১,৯২৩টি, যৌতুক, জমি ও অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত বিরোধের সংখ্যা যথাক্রমে ২,৩৫১টি, ৯৩৮টি এবং ১,০৫৮টি। এছাড়া ৩৬টি দ্বিতীয় বিয়ে এবং ৫৪৮টি সামাজিক বিরোধের মীমাংসা সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। নিষ্পত্তিকৃত সালিশের মধ্যে পারিবারিক ও যৌতুক সংক্রান্ত বিরোধের সংখ্যাই বেশি। [১৩]

অধিকাংশ বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে। পারিবারিক বিরোধের অধিকাংশের নিষ্পত্তি ঘটেছে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে তালাকের মাধ্যমে। লক্ষ্য করা গেছে যে, সালিশে উপস্থিত বিবদমান পক্ষদ্বয়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই সালিশকারগণ খোরপোষ বা ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকেন। আর্থিক বিষয়ে অধিকাংশ বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে থাকে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থ ফেরৎ প্রদানের মাধ্যমে, জমি সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে জমির সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারণ ও পজেশন বুঝে নেবার মধ্য দিয়ে অথবা বাদীকে জমি ফেরৎ প্রদানের মধ্য দিয়ে। যদি নিষ্পত্তিকৃত বিষয়ে পুনরায় বিরোধ সংঘঠিত হয় তবে পুনরায় সালিশ বসে। এম. এল. এ. এ'র কর্মীদের তথ্যানুসারে নিষ্পত্তিকৃত বিষয়ের মধ্যে ৫%-৮% বিষয়ে পুনরায় বিরোধ সংঘঠিত হয় ও সালিশ বসে। তার মধ্যে যেগুলো মীমাংসার উপযোগী নয় সেগুলো আদালতে চলে যায়।

সালিশে নারীর অংশগ্রহণ

সালিশের সূচনালগ্ন থেকে পুরুষরাই মুখ্য ভুমিকা পালন করে আসছে। প্রথা ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল্যজনিত কারণে সালিশে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। নারীরা কেবল ঘটনার সাক্ষী, প্রতিপক্ষ কিংবা বাদী হিসেবে সালিশে উপস্থিত থাকতে পারে। তবে এক্ষেত্রে উচ্চস্বরে কথা বলা যাবে না, শালীনভাবে বসতে হবে, যখন বলা হবে কেবল তখনই কথা বলবে- এরকম নানা শর্ত মেনে চলতে হয়। সালিশে বসা, রায় দেয়ার মত মুখ্য ভূমিকা রাখবার সুযোগ তাদের নেই। তবে আশির দশকের শেষ দিকে এনজিও কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিচরণের সুযোগ তৈরী হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে দাতাসংস্থাগুলো নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করেছে। ফলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ কাঠামোয় অংশগ্রহণের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব- এই ধারণা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় বিচার কাঠামোয় নারীর অংশগ্রহণ গুরুত্ব পাচ্ছে। এম. এল. এ. এ সালিশে নারী অংশগ্রহণের জন্য গ্রামসালিশ কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ পদ নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া সালিশকমিটির সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের আইন ও সালিশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০০৫-২০০৬ সালে ৯১ জন ইউপি নারী সদস্যদেরকে এম. এল. এ. এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যেন তাঁরা কার্যকরভাবে বিরোধের মীমাংসা করতে পারেন।

উপসংহার

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিরসনে নানা উপাদান বা ফ্যাক্টর যুক্ত হলেও সালিশী ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটেনি বরং সনাতন এই ব্যবস্থাটিকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। কিন্তু দাতাসংস্থার সাহায্যের ওপর নির্ভর করে কয়েকটি এনজিও'র পক্ষে বিস্তৃত পরিসরে সাধারণ জনগণকে আইনগত বিষয়ে সচেতন করা কতটুকু সম্ভব সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। লক্ষ্য করা গেছে যে, আইন ও সালিশের মতো জটিল একটি প্রক্রিয়াকে ৩ দিন বা ৬ দিনের প্রশিক্ষণে রপ্ত করা কতটুকু সম্ভব তা প্রশ্নের অবকাশ রাখে। এছাড়া একজন সালিশকর্মী তিনি পুরুষ বা নারী যেই হোন না কেন তার একার পক্ষে স্বল্প বেতন ও দাপ্তরিক সুবিধাহীনভাবে প্রতিমাসে ৩০/৪০টি বিরোধ মীমাংসার জন্য সালিশ অনুষ্ঠান করা দুরূহ কাজ। এটি আরো কঠিন হয়ে পড়ে যখন স্থানীয় জনগণ সালিশ অনুষ্ঠানের যাবতীয় কাজকে সালিশকর্মীর কাজ বলে মনে করে এবং আর্থিক সুবিধা ছাড়া সালিশে যেতে সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুভব করেন না। এছাড়া, দাতা সংস্থার অনুদান এই খাত/প্রকল্প সংকুচিত করে অন্য খাতে/প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করে এনজিওকর্মীদের পক্ষে এ বিষয়ে কাজ করার সুযোগও সংকুচিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্য বা প্রকল্প অনুদানের ওপর নির্ভর না করে বেসরকারি সংগঠনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে সালিশ ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা সরকারের পক্ষেই সম্ভব।

তথ্যসূত্র

১ হক কাজী এবাদুল, বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ: ৪০।

২ ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ:১৭৩।

৩ মৈত্রী রবি শংকর, বিদেশী বাঙলা শব্দের অভিধান, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৭১।

৪ Wood, Geoffrey D, "Class Differentiation and Power in Badokgram: The minifundist case". In Explotation and Rural Poor, edited by in Ammenul Huq, Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla, 1978.

৫ আরেন্স, ইয়েনেকা ও ব্যুরদেন, ইওকাফন, ঝগড়াপুরঃ গ্রাম বাংলার গৃহস্থ ও নারী, অনুবাদ নিলুফার মতিন, গণপ্রকাশনী ঢাকা, ১৯৮০।

৬ Jaman, M.Q, Social Conflict and Political Process in Rural Bangladesh – A Case Study, Unpublished M. Phil Thesis. Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1977.

৭ Ellickson, Jean, A Beliecer among Beliecers: The Religious Beliefs, Practices, and Manings in a Village in Bangladesh. Unpublished Ph. D. Desertation, Michigan State University, 1972.

৮ Zaidi, SM Haffeez, The Village Culture in Transition: A Study of East Pakistan Rural Society, East-West Centre Press, Honolulu, 1970.

৯ Karim, A.H.M. Zehadul, The Patterns of Rural Leadership in an Agrarian Society, Northern Book Centre, New Delhi, 1990.

১০ Bertocci, Peter J., Ellusive Villages: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan, mimeo, Michigan State University, 1972.

১১ জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খাঁন, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী সংগ্রাম, (অনুবাদ), ডালেম চন্দ্র বর্মণ ও সুরাইয়া বেগম, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৩

১২ Barman, Dalem Ch., Emenrging Leadership Patterns in Rural Bangladesh: A Study, Centre for Social Studies, Dhaka University, Dhaka, 1988.

১৩. Annual Activity Report 2005-2006, Madaripur Legal Aid Association, Madaripur September 2006, p.46.